কিষান স্বরাজ - ৮

নতুন কৃষি আইনে চাষবাসে

অর্থনীতি সংকেত

প্রণয়ন: **সুব্রত কুণ্ডু** ।। প্রচ্ছদ: **অভিজিত দাস** ।। অঙ্গসাজ: **শিপ্রা দাস** ।।

প্রচ্ছদের কার্টুন: https://www.rediff.com/news/report/doms-take-setting-the-farmers-free/20200925.htm

□

তিনটি কৃষি আইন নিয়ে এযাবৎ পক্ষে বিপক্ষে অনেক কথা হয়েছে। কিন্তু আইনগুলির একের সঙ্গে অন্যের সম্পর্ক কী? চাষ সংক্রান্ত বিমা, ঋণ ইত্যাদির সঙ্গেই বা কী সম্পর্ক, তা নিয়ে খুব একটা আলোচনা হচ্ছে না। আমরা মনে করি, কৃষির কর্পোরেটায়নের বীজ লুকিয়ে আছে এই আইনসহ সরকারের বিভিন্ন কার্যক্রমে। আর এই কথাগুলি বিশদে চাষিসহ সাধারণ মানুষের সামনে তুলে ধরা দরকার। কারণ আইনগুলিতে শুধু চাষিদের ক্ষতি হবে না। ক্রেতা হিসেবে ক্ষতি হবে সব মানুষের। ধ্বংস হবে খাদ্য নিরাপত্তা। আরো ক্ষতি হবে পরিবেশের।

সূচনা

গঙ্গাচরণ পুরোহিতের কুঁড়ের সামনে বিশাল বট গাছ। তার তলায় পড়ে রয়েছে ‘ছোট জাতের’ মতি। গঙ্গাচরণের স্ত্রী অনঙ্গ এসে তাকে খাবার আর জল দেয়। খেয়ে নিতে বলে। অনাহারক্লিষ্ট মতি জিগ্যেস করে, মাছের ঝোল? অনঙ্গ বলে মাছের ঝোল কোথায় পাব! কচু। খেয়ে নে। অনঙ্গ ফিরে যায়। মতি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে। দূরে দাঁড়িয়ে পুরো ঘটনা লক্ষ্য করে একটি ছোট মেয়ে। পরে মতির জন্য রাখা কলাপাতায় মোড়া খাবার নিয়ে ছুট দেয়।

ছুটকি এসে অনঙ্গকে ঢিপ করে প্রণাম করে বলে, তুমি সতী লক্ষ্মী। আশীর্বাদ কর নরকে গিয়েও যেন দুটি খেতে পাই। বলেই দৌড়ে বেরিয়ে যায়। দোর অবধি আসে অনঙ্গ। শুধোয় কোথায় যাচ্ছিস? ছুটকি জবাব দেয়, শহরে। খেতে।

শেষে কাতারে কাতারে মানুষের গ্রাম ছেড়ে যাওয়ার দৃশ্য পর্দায় ভেসে ওঠে। ১৯৪৩ সালে মানুষের সৃষ্টি করা দুর্ভিক্ষের পটভূমিতে তৈরি সত্যজিত রায়ের অশনি সংকেত সিনেমার শেষের দিকের

কয়েকটি দৃশ্য। এই দুর্ভিক্ষে বাংলায় ৫০ লক্ষেরও বেশি মানুষ মারা যায়। অমর্ত্য সেন নানা তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন, পর্যাপ্ত খাবার থাকতেও এই দুর্ভিক্ষ ছিল ব্রিটিশ শাসক এবং অসাধু মজুতদারদের তৈরি।

ভারতে আজকে যারা কোটি-কোটিপতি ব্যবসায়ী তাদের পূর্ব পুরুষেরা অনেকেই এই সময়, অর্থাৎ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এবং তার পরবর্তী সময়ে খাদ্য এবং আবশ্যিক পণ্যের মজুত এবং কালোবাজারি করে কোটিপতি হয়েছিল।

এই একচেটিয়া ব্যবসা, মজুতদারি এবং কালোবাজারির সম্ভাবনা স্বাধীন ভারতের নীতিকারেরা বুঝেছিলেন। আর সেজন্যই দেশে প্রথমদিকে যে আইনগুলি প্রণয়ন করা হয়, তার মধ্যে অন্যতম ১৯৫৫ সালের এসেনশিয়াল কমোডিটিস অ্যাক্ট বা অত্যাবশ্যক পণ্য আইন। একচেটিয়া ব্যবসা, মজুতদারি এবং কালোবাজারি দূর করার জন্য বেশিরভাগ সাংসদদের সমর্থনে এই আইন গৃহীত হয়। এতে ধারাবাহিকভাবে নিত্য প্রয়োজনীয় অত্যাবশ্যক পণ্যগুলির একচেটিয়া ব্যবসা, মজুতদারি এবং কালোবাজারি অনেকটাই কমে এবং জিনিসপত্রের দাম অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে আসে।

তিনটি আইন এবং কর্পোরেট কৃষি

কিন্তু গত ৩ জুন কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভা এসেনশিয়াল কমোডিটিস (অ্যামেন্ডমেন্ট) বা অত্যাবশ্যকীয় পণ্য (সংশোধন) অধ্যাদেশ বা অর্ডিন্যান্স জারি করে। এছাড়া ওই একইদিনে দ্য ফার্মার্স প্রোডিউস ট্রেড অ্যান্ড কমার্স (প্রোমোশন অ্যান্ড ফেসিলিটেসন) বা কৃষি উৎপাদন ব্যবসা এবং বাণিজ্য (সহায়তা এবং সম্প্রসারণ) অর্ডিন্যান্স ২০২০, আর দ্য ফার্মার্স (এমপাওয়ারমেন্ট অ্যান্ড প্রোটেকশন) এগ্রিমেন্ট অন প্রাইস অ্যাসিওরেন্স অ্যান্ড ফার্ম সার্ভিসেস বা ফসলের দামের নিশ্চিতি এবং কৃষি পরিষেবার ক্ষেত্রে চাষির (ক্ষমতায়ন এবং সুরক্ষা) চুক্তি অর্ডিন্যান্স ২০২০, জারি করে কেন্দ্রীয় সরকার।

এরপরে বাদল অধিবেশনের শেষের দিকে, কোনোরকম গণতান্ত্রিক রীতিনীতি তোয়াক্কা না করে, আলাপ আলোচনা না করে সংসদে আইন হিসেবে ওই তিনটি অধ্যাদেশই বিল হিসেবে পেশ করে এবং তা পাশ করিয়ে নেয়।

আমরা মনে করি, কৃষি রাজ্যের আওতায় থাকলেও এই তিনটি আইনের মাধ্যমে সম্পূর্ণ কৃষি ব্যবস্থাটাই নিজেদের নিয়ন্ত্রণে এনে তা কর্পোরেটের হাতে তুলে দেওয়ার পথ তৈরি করছে কেন্দ্রীয় সরকার। এছাড়াও চাষের সামগ্রী বহনের জন্য অপারেশন গ্রিন, এক লক্ষ কোটি টাকার কৃষি প্যাকেজ (যার মধ্যে ঋণই বেশি), বিমা ইত্যাদি সিদ্ধান্ত এই পথকে আরো মসৃণ করারই উদ্যোগ। এতে একচেটিয়া ব্যবসা, মজুতদারি এবং প্রয়োজনীয় সামগ্রীর অনিয়ন্ত্রিত দাম বৃদ্ধির সম্ভাবনা বাড়বে। বাড়বে কালোবাজারি। নিচে আমরা সেই কথাই বিশ্লেষণ করেছি।

অত্যাবশ্যকীয় পণ্য সংশোধন আইন

কেন্দ্রীয় সরকারের বক্তব্য অনুযায়ী অত্যাবশ্যকীয় পণ্য (সংশোধন) আইনের ফলে খাদ্যশস্য, খাদ্যবীজ, তেলবীজ, ভোজ্য তেল, পেঁয়াজ ও আলুর মত পণ্য নিয়ন্ত্রিণ মুক্ত করা হয়েছে। কারণ মজুতদারি এবং কালোবাজারি রুখতে ১৯৫৫ সালে তৈরি আইন বর্তমান সময়ে উপযুক্ত নয়। এই আইন তখন প্রণয়ন হয়েছিল যখন দেশে খাদ্যশস্যের ব্যাপক অভাব ছিল। দেশকে নির্ভর করতে হত আমদানি ও সাহায্যের উপর, যেমন আমেরিকা থেকে পিএল ৪৮০ গম আনতে হয়েছিল। সরকার মনে করছে, এখন পরিস্থিতি পাল্টেছে। গ্রাহক, খাদ্য ও জনসরবরাহ মন্ত্রকের এক নোটে দেখানো হয়েছে, এখন গম উৎপাদন বেড়েছে ১০ গুণ, ধান উৎপাদন বেড়েছে চার গুণ। খাদ্যশস্যের বীজের উৎপাদন বেড়েছে আড়াই গুণ। কার্যত ভারত এখন বেশ কিছু কৃষিপণ্য রফতানি করে।

সংশোধিত আইনে কৃষিপণ্য, অর্থাৎ, খাদ্যশস্য, খাদ্যবীজ, তেলবীজ, ভোজ্য তেল, আলু এবং অন্যান্য জিনিস অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতে নিয়ন্ত্রিত হবে। যার মধ্যে রয়েছে অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি, যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ এবং গুরুতর প্রাকৃতিক বিপর্যয়। অর্থাৎ স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে এগুলির দাম নিয়ন্ত্রণের কোনো প্রয়োজন নেই। আর অস্বাভাবিক পরিস্থিতি কখন, তা নির্দিষ্ট করবে সরকার।

আগে যে শক্তিশালী অত্যাবশ্যকীয় পণ্য আইন ছিল তাতেও বিভিন্ন প্রভাবশালী, সুযোগ সন্ধানী এবং দুর্নীতিগ্রস্ত ব্যবসায়ী, মজুতদারি এবং কালোবাজারির খেলা চালাতো। কিন্তু এখন অবাধ মজুতদারির এই আইনের মাধ্যমে, কৃষি পণ্যের অনিয়ন্ত্রিত দামের খেলা লাগামছাড়া হয়ে যাবে।

এই আইনের ২ এ ধারায় বলা হয়েছে, অত্যাবশ্যকীয় পণ্য হল এই আইনে তালিকাভুক্ত কোনো পণ্য। তবে আইনটিতে কেন্দ্রীয় সরকারকে কোনো পণ্য তালিকাযুক্ত করার ও তালিকা থেকে বাদ দেওয়ার অধিকার দেওয়া রয়েছে। বলা হয়েছে, কেন্দ্র যদি মনে করে

জনস্বার্থে কোনো পণ্যকে অত্যবশ্যকীয় বলে তালিকাভুক্তির প্রয়োজন আছে, তাহলে রাজ্য সরকারগুলির সঙ্গে আলোচনা করে তারা তা করতে পারবে।

আগের আইন অনুযায়ী অত্যাবশ্যক তালিকায় যে পণ্যগুলি ছিল সেগুলি হল, ওষুধ, সব রকমের সার, খাদ্যদ্রব্য-ভোজ্য তেল, সম্পূর্ণ তুলো থেকে তৈরি সুতো, পেট্রোলিয়ম ও পেট্রোলিয়ামজাত পণ্য, কাঁচা পাট ও পাটজাত পোশাক, খাদ্যশস্যের বীজ ও ফল ও সবজি বীজ, গবাদি পশুর খাদ্যবীজ, পাটের বীজ, তুলোর বীজ, ফেস মাস্ক ও হ্যান্ড স্যানিটাইজার। ফেস মাস্ক ও হ্যান্ড স্যানিটাইজার পণ্য দুটি কোভিড-১৯ মহামারির জন্য ১৩ মার্চ এই তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। এই সময় থেকে এই পণ্য দুটির উৎপাদন, সরবরাহ এবং বিতরণ নিয়ন্ত্রিত ও তা মজুতের ঊর্ধ্বসীমা স্থির করার দায়িত্ব ছিল সরকারের। তবে সরকারের সিদ্ধান্তের পরেও জুন মাস অবধি এই দুটি পণ্যের কালোবাজারির অভিজ্ঞতা আমাদের হয়েছে। সম্প্রতি পণ্য দুটি সরবরাহ পর্যাপ্ত পরিমাণে হওয়ায়, এগুলি তালিকা

থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ কড়া নিয়ন্ত্রণ আইন থাকতেও যেখানে মজুতদারি এবং তার থেকে কালোবাজারি রোখা যায়নি। সেখানে নিয়ন্ত্রণহীন অবস্থায় মজুতদারি করে কৃত্তিম অভাব তৈরি করা হবে, একথা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। এজন্য কালোবাজারির মাধ্যমে জিনিসের দাম বাড়বেই।

আইনে বলা হয়েছে, যদি ফল-মুলের (হর্টিকালচার বা উদ্যানপালন জাত ফসল) দামের গতবছরের দাম বা গত পাঁচ বছরের গড় দামের ১০০ শতাংশ বৃদ্ধি ঘটে আর যদি খাদ্য শস্যের খুচরো দামে গত বছরের তুলনায় বা গত পাঁচ বছরের গড় দামের ৫০ শতাংশ বৃদ্ধি ঘটলে সরকার তখন হস্তক্ষেপ করবে।

আমরা জানি সবজি ফল ইত্যাদির দাম সারা বছরই ওঠানামা করে নানা কারণে। এক্ষেত্রে ধরা যাক এই সব সামগ্রীর মধ্যে কোনো একটির গত পাঁচ বছরের গড় দাম ১০০ টাকা। তাহলে এই আইন অনুযায়ী, যদি সেই সামগ্রীটির দাম ২০০ টাকা হয় তবেই সরকার

হস্তক্ষেপ করে অত্যাবশ্যক পণ্যের আওতায় নিয়ে আসতে পারবে। কিন্তু যদি ১৫০ বা ১৮০ টাকা হয় তবে তা এই আইনের আওতায় আসবে না। অর্থাৎ বোঝাই যাচ্ছে বর্তমান আইনে ক্রেতার কোনো লাভ হবে না। মনে রাখা দরকার, আমরা সবাই ক্রেতা। যে চাষি ফসল ফলায় তাকেও বাজার থেকে কৃষিসহ বিভিন্ন সামগ্রী কিনতে হয়। তাই ক্রেতা হিসেবে তাকেও বেশি দাম দিতে হবে। তবে কি বিক্রেতা হিসেবে চাষির লাভ হবে এই ব্যবস্থায়? আমাদের উত্তর না। কারণ বেশিরভাগ চাষিরই সবজি-ফল ইত্যাদি মজুত করার ক্ষমতা নেই। তাকে তার উৎপাদন বাজারে নিয়ে আসতে হবে এবং মজুতদার ব্যবসায়ীর ঠিক করা দামেই তা বিক্রি করতে হবে। আগে স্থানীয় মজুতদার ফসল কিনত। তারা চাষিদের শোষণ করতো কিন্তু চাষিদের নানারকম ধার, ইন্ধন ইত্যাদি সহায়তার নামে তাদের বাঁচিয়েও রাখত। কিন্তু এখন বড় মজুতদার ব্যবসায়ীরা নানা অছিলায় দামতো কম দেবেই, আর চাষি এবং এইসব মধ্যস্বত্তভোগীদের হটিয়ে দেবে চাষ থেকে।

এই আইনে বলা হয়েছে, কৃষিপণ্যের কোনো প্রসেসর বা ভ্যালু চেইন পার্টিসিপ্যান্টসের ক্ষেত্রে মজুতের সীমা নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত আদেশ প্রযোজ্য হবে না - যদি না এই জাতীয় অংশগ্রহণকারীরা কোনো ফসলের ধার্য ক্ষমতা (ইনস্টলড ক্যাপাসিটি) মজুতের ঊর্ধ্বসীমা লঙ্ঘন করে। ভ্যালু চেইন পার্টিসিপ্যান্ট বলতে পণ্য উৎপাদন থেকে বিপণনের সমগ্র প্রক্রিয়ায় যারাই যুক্ত তা সে প্যাকেজিং-এর কাজ হোক গুদামজাত করার কাজ, পরিবহনের কাজ যাবতীয় সবকিছুকেই বোঝায়। ধরা যাক কোনো কোম্পানিকে প্রতিমাসে ১০০০ টন পেঁয়াজ পরিবহনের অনুমতি দিয়েছে সরকার । তাহলে তার বেশি পেঁয়াজ যদি ওই কোম্পানি মজুত করে তবেই সরকার তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবে। এছাড়া ওই একই কোম্পানির যদি রফতানি করার সরকারি অনুমোদন থাকে তবে তার এই পেঁয়াজ মজুতের কোনো ঊর্ধ্বসীমা থাকবে না। এখানে বলে রাখা ভাল সাধারণত ভ্যালু চেইন

পার্টিসিপ্যান্টগুলি একইসঙ্গে নানা কাজ করে। ফলে এই ঊর্ধ্বসীমার যে গল্প, তা এদের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করার কোনো কারণই থাকবে না। যদি কখনো সরকারের সদিচ্ছা হয় তাহলেও আইনি মারপ্যাঁচে কোম্পানিগুলির লাগাম পাওয়া বেশ কঠিন। কালোবাজারি করে কোটি কোটি টাকার মুনাফা করলেও তাদের কেশাগ্র ছোঁয়ার ক্ষমতা সরকারের থাকবে না। আর যাতে তাদের ছুঁতে না হয় তার জন্যেই তো নতুন আইন । নাহলে সংসদে আলোচনা না করে কোভিড মহামারির সময়ে এই আইন কেন জারি করা হল?

এই আইনটির ঘোষিত লক্ষ্যে বলা হয়েছে, এতে ফসল উৎপাদন করা, মজুত করা, এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় নিয়ে যাওয়া, সরবরাহ করার মুক্ত পরিস্থিতি তৈরি হবে। ফলে অর্থনৈতিক উন্নতি হবে। আর্থিক লেনদেন বাড়বে। কৃষিক্ষেত্রে ব্যক্তি মালিকানাধীন কোম্পানি এবং বিদেশি বিনিয়োগ বাড়বে। সংরক্ষণ অর্থাৎ হিমঘর, ফসলের হিমায়িত পরিবহন ব্যবস্থা এবং খাদ্য সরবরাহ ব্যবস্থার আধুনিকীকরণ ঘটবে। সরকারের আরো দাবি,

এসবের ফলে দ্রব্যমূল্যের স্থিতাবস্থা বজায় থাকবে যা ক্রেতা এবং ব্যবসাদার উভয়ের জন্যই লাভজনক হবে।

সরকারের ঘোষিত এই লক্ষ্য কতটা অসার তা এবার দেখা যাক। শক্তিশালী মজুতদার বিরোধী আইন থাকা সত্ত্বেও, নরেন্দ্র মোদি সরকারের প্রথম পর্বের শাসনকালে (অক্টোবর, ২০১৫) রাতারাতি অড়হড় ডালের দাম হয় কেজি প্রতি ২০০ টাকা। এক্ষেত্রে আয়কর দফতরের তদন্তে উঠে আসে ২.৫ লক্ষ কোটি টাকার দুর্নীতির গল্প। কী করে অসাধু ব্যবসায়ীদের চক্র রাতারাতি দাম বাড়িয়ে দেয় তার রোমাঞ্চকর বিবরণ আছে 'aprisal report in the case of pulse imports and traders group' শীর্ষক ডাল রফতানির প্রতিবেদনে। সে সময় এই অত্যাবশ্যক আইনকে কাজে লাগিয়ে সরকারি এজেন্সিগুলি ৭০,০০০ মেট্রিক টন ডাল বাজেয়াপ্ত করে। এখন

সীমাহীন মজুতদারির এই আইনে কত লক্ষ কোটি টাকার দুর্নীতি প্রতিদিন ঘটবে এই উদাহরণ থেকে তা সহজেই বোঝা যায়।

কৃষি উৎপাদন ব্যবসা ও বাণিজ্য সহায়তা এবং সম্প্রসারণ আইন

দ্বিতীয় আইনটি হল দ্য ফার্মার্স প্রোডিউস ট্রেড অ্যান্ড কমার্স (প্রোমোশন অ্যান্ড ফেসিলিটেসন) বা কৃষি উৎপাদন ব্যবসা এবং বাণিজ্য (সহায়তা এবং সম্প্রসারণ) আইন ২০২০। এই আইনটির ঘোষিত লক্ষ্য হল, চাষির উৎপাদিত ফসল কেনাবেচার ক্ষেত্রে তার পছন্দ মতো লেনদেনের সুযোগ তৈরি করা। এতে কৃষি ব্যবসায় প্রতিযোগিতার পথ খুলে গিয়ে লাভজনক দাম পাওয়ার সুযোগ বাড়বে। কৃষিপণ্যের আন্তঃরাজ্য ব্যবসা অবাধ হবে। আর রাজ্য সরকারের আওতায় এগ্রিকালচার প্রোডিউস মার্কেটিং (বা এপিএমসি) আইনের মাধ্যমে তৈরি নিয়ন্ত্রিত কৃষি বাজারের বাইরে এবং অনলাইনে কৃষিপণ্যের কেনাবেচার সুযোগ তৈরি হবে। আর এসবের জন্য প্রয়োজনীয় কৃষি ব্যবসার পরিকাঠামো তৈরি করা হবে।

এই আইনটিতে উৎপাদিত ফসলের মধ্যে চাল, গম থেকে শুরু করে ডাল, তেলবীজ, তেল, সবজি, ফল, বাদাম, মশলা, আখ ইত্যাদি ছাড়াও হাঁস, মুরগি, শুয়োর, ছাগল, মাছ ও দুগ্ধজাত দ্রব্য ধরা হয়েছে। গো-খাদ্য, খোল, তুলোর বীজ, তুলো ও পাটকেও ধরা হয়েছে। এছাড়া এখানে ব্যক্তি চাষি ছাড়াও বিভিন্ন চাষিদের সংগঠনকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। একই সঙ্গে বলা হয়েছে এই ব্যবসার জন্য যে পরিকাঠামো তৈরি হবে তা এপিএমসি আইনের আওতায় পড়বে না। তবে কেউ যদি নিয়ন্ত্রিত বাজারে তাদের মাল কেনাবেচা করতে চায় তা তারা করতেই পারে।

আইনটিতে এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে চাষি ও ব্যবসায়ী বাধাহীনভাবে ব্যবসা করতে পারবে। একই সঙ্গে বৈদ্যুতিন পদ্ধতিতে বা অনলাইনেও কৃষি সামগ্রী কেনাবেচা করা যাবে। এক্ষেত্রে আন্তঃরাজ্য ব্যবসা ও আর্থিক লেনদেন বিষয়ে প্রযুক্তিগত ও নিয়ম-

নীতি তৈরি করবে কেন্দ্রীয় সরকার। এই আইনে বলা হয়েছে যেসব চাষি বা ব্যবসায়ী নতুন আইনে ব্যবসা করবে তাদের থেকে রাজ্যের এপিএমসি আইন বা রাজ্যের অন্য কোনো আইনে ফি, সেস বা লেভি আদায় করা যাবে না। পুরানো এপিএমসি আইনে যারা চাষিদের থেকে সামগ্রী কিনতো তাদের ৬ শতাংশ ট্যাক্স এবং অন্যান্য সেস বা লেভি দিতে হত রাজ্য সরকারকে। এতে সরকারের কিছু আয় হত। নতুন আইনে তা তুলে দেওয়া হল। উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, পুরোনো আইনে কয়েকটি দানাশস্য যেমন চাল, গম, তেলবীজ ইত্যাদি বিক্রি হত। এর মধ্যে বেশিরভাগটাই ছিল চাল ও গমের বিক্রি। সরকারের নির্ধারিত ন্যূনতম সহায়ক মূল্যে (এমএসপি) এগুলি বিক্রি হত। আর ফুড কর্পোরেশন অব ইন্ডিয়া (এফসিআই) নাফেড সেই ফসল কিনে নিত আড়াই শতাংশ বেশি দাম দিয়ে। এই ফসল রেশনের মাধ্যমে গরিব মানুষদের সরবরাহ করা হত। নতুন আইনের ফলে রেশন ব্যবস্থা অর্থাৎ সাধারণ মানুষদের খাদ্য নিরাপত্তাটাই প্রশ্নচিহ্নের মুখে পড়ে গেল। চাল গম ছাড়া অন্যান্য ফসল সবজি আগে থেকেই কিন্তু অবাধ বিক্রির ব্যবস্থা ছিল। তাহলে কেন এই আইন?

উত্তর হল, রাজ্য তালিকায় কৃষি থাকলেও, কৃষি ব্যবসাকে রাজ্যের হাত থেকে তুলে নেওয়া। কারণ যে এপিএমসি আইনের মাধ্যেমে সরকারগুলি কৃষি ব্যবসাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারতো। প্রয়োজন পড়লে মজুতদারি কালোবাজারি ঠেকাতে পারতো। আর যার থেকে রাজ্য সরকারের কিছু আয় হত, তা বন্ধ করে কৃষি ব্যবসা সম্পূর্ণ কর্পোরেটের হাতে তুলে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হল আইনটির মাধ্যমে।

বর্তমান এপিএমসি আইনে নানা ফাঁকফোকর আছে। এর সংশোধন দরকার বলে চাষিরাই দাবী করে এসেছেন। এতদিন চাষি যে ফসলের খুব ভাল দাম পেত, তা নয়। ফসলের ন্যায্য দাম পাওয়ার জন্য কেন্দ্রীয় বা রাজ্য সরকারগুলি তাদের ন্যূনতম দায়িত্বও কোনোদিন পালন করেনি। কিন্তু তা সত্ত্বেও এপিএমসি বা কৃষিপণ্য

বাজার কমিটি আইনে কর্পোরেট বা বৃহৎ ব্যবসায়ীদের কৃষিপণ্যের বাজারের উপর একচেটিয়া দখলদারি থেকে আটকানোর ব্যবস্থা ছিল। পুরোনো আইনে কৃষিপণ্য বাজার কমিটি নিজেরা ফসলের ক্রেতা ছিল না। ছিল চাষির ফসল বিক্রি এবং ব্যবসায়ীর কেনা বেচার সমন্বয়কারী। আর সরকার ছিল তদারককারী। ফলে সরকারের একটা দায় ছিল এবং তাদের জবাবদিহি করার একটা সুযোগ ছিল। সেখানে চাষি সংগঠনগুলির প্রতিনিধিদের চাষির স্বার্থ তুলে ধরার সুযোগ ছিল। নতুন ব্যবস্থায় চাষ তুলে দেওয়া হল বৃহৎ কর্পোরেট ক্রেতাদের হাতে। এতে নাকি ফড়েরাজ খতম হবে। আসলে স্থানীয় চেনা-পরিচিত ছোট ফড়েদের হাত থেকে সরিয়ে চাষিদের বৃহৎ ফড়েদের হাতে তুলে দেওয়া হল। অর্থাৎ ফাঁকফোকর_মেরামতি নয় পুরো বাজারটিই তুলে দেওয়ার ব্যবস্থা হল। সরকারের নীতি হল কেউ অসুস্থ হলে তাকে না সারিয়ে মেরে ফেলা, যাতে ল্যাটা চুকে যায়। নতুন ব্যবস্থায় ফসল ক্রয়ে কোনো নিয়ন্ত্রণ না থাকায় যারা বিপুল পুঁজি নিয়ে আসরে নামবে, তারা সহজেই অপেক্ষাকৃত দুর্বলদের ব্যবসার তল্পি গুটিয়ে ফেলতে বাধ্য করবে।

এখানে আগ্রাসী কর্পোরেটের উদাহরণ দিলে বোঝা যাবে, কীভাবে তারা সম্পূর্ণ বাজার ব্যবস্থাটাকে ধ্বংস করে, চাষিদের বাধ্য করে কম দামে কৃষি সামগ্রী বিক্রি করতে। আইটিসি'র প্রধান ব্যবসা তামাকজাত সামগ্রী হলেও নব্বই-এর দশকে এরা কৃষি ক্ষেত্রে প্রবেশ করে। ২০০০ সালে আইটিসি চৌপল, চাষিদের কাছ থেকে সয়াবিন কিনতে শুরু করে। কোম্পানিটি ২০০১-০২ সালে ৬০ হাজার এবং ২০০২-০৩ সালে ২,১০,০০০ মেট্রিক টন সয়াবিন কেনে বাজার থেকে। প্রাথমিকভাবে ভালো দাম পাওয়ায় বহু চাষি সয়াবিন চাষ শুরু করে। অন্যদিকে পর পর দুবছর বাজার না হওয়ায় মান্ডি (এপিএমসি বাজার) ব্যবস্থা ভেঙে পড়ে। ছোট কোম্পানি যারা সয়াবিন থেকে বিভিন্ন সামগ্রী বানাতো, কাঁচা মালের অভাবে তারাও বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে আইটিসি'র একচেটিয়া সংগ্রহের জন্য। এরপর আসল খেলা

শুরু হয়। কিছুদিনের মধ্যেই অতিরিক্ত আর্দ্রতা বা কম গুণমানের অজুহাতে সয়াবিনের দাম কমিয়ে দেয় এবং বেশিরভাগ ফসল কিনতে অস্বীকার করে। ফলে চাষিদের কাছে সয়াবিন বিক্রির আরো কোনো খরিদ্দার না থাকায় অনেক কম দামে আইটিসি'র কাছে সয়াবিন বিক্রি করতে বাধ্য হয়।

এই আইনটিতে বলা হয়েছে, অনিয়ন্ত্রিত এই বাজারে যারা চাষির থেকে কৃষিপণ্য কিনবে বা তাদের জন্য ব্যবস্থা থাকবে গুদাম ও হিমঘরের। অথচ এমন নিয়ম করা হয়নি যে, চাষি বাজারে ফসল আনলে তা কিনতে বাধ্য থাকবে ব্যবসায়ীরা। তাহলে চাষির স্বার্থ কীভাবে রক্ষিত হবে? তার কোনো উত্তর নেই। অথচ নতুন আইনের পক্ষে গালভরা কথায় বলা হচ্ছে 'চাষির স্বাধীনতা থাকবে যেখানে ভালো দাম পাবে সেখানে বেচবার'।

আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, আইনে বলা হয়েছে, যে কোনো ব্যক্তি যার প্যানকার্ড আছে, সেই ব্যক্তি ভারতের যে কোনো জায়গা থেকে কৃষি সামগ্রী কিনতে পারবে। এর অর্থ হল, পশ্চিমবঙ্গের কোনো প্যানকার্ডধারী যে কোনো রাজ্যের চাষিদের থেকে কৃষি সামগ্রী কিনতে পারবে কোনরকম লাইসেন্স ছাড়াই। এক্ষেত্রে বেশি দাম পাওয়ার আশায় অনেক চাষিই জালিয়াতির খপ্পরে পড়তে পারে। এই ধরনের ঘটনা ঘটলে আইনে বলা হয়েছে, সরকারি আধিকারিকরা তার মীমাংসা করবে। তবে ভুক্তভোগী চাষিকে এই নিয়ে অভিযোগ জানাতে হবে। আমরা অভিজ্ঞতায় দেখেছি, সরকারি ব্যবস্থায় চাষিদের কথা কতটা শোনা হয়! ফলে চাষিরাই আরো কোণঠাসা হবে।

দ্বিতীয়ত রাজ্য সরকারগুলির আয়ের একটি পথ ছিল কৃষি ব্যবসা। কিন্তু মুক্ত বাণিজ্যের নামে সম্পূর্ণ ব্যবস্থা বড় বড় কর্পোরেশনের হাতে তুলে দেওয়া হলে রাজ্য তো নয়ই, কেন্দ্র সরকারেরও কৃষি ব্যবসা থেকে আয়ের পথ বন্ধ হবে। এতে লাভবান হবে কর্পোরেট বা বড় ব্যবসায়ীরা। আর চাষিদের মুক্ত বাণিজ্যের

ফলে আয় বাড়বে বলে যে কথা বলা হচ্ছে তাও বাস্তবে সম্ভব হবে না। কারণ বৃহৎ কর্পোরেশনের সঙ্গে হাড়গিলে চাষির প্রতিযোগিতা এবং দরাদরির ক্ষমতা এক অবান্তর কষ্টকল্পনা।

এপিএমসি আইনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে বহুদিন ধরে কেন্দ্রীয় সরকার কৃষি বাজারের সংস্কারের জন্য একটা মডেল আইন আনার চেষ্টা করছিল। ইতিমধ্যেই ইউপিএ এবং এনডিএ সরকার এই আইনের কিছু সংশোধন করেছে। লক্ষ্য ছিল এপিএমসি আইনের ক্ষমতা হ্রাস করে কর্পোরেটগুলির একচেটিয়া অধিকার কায়েম করা। কৃষিকে শিল্পে পরিণত করা। কিন্তু রাজ্য সরকারগুলি এই ব্যবস্থার অংশীদার হতে চায়নি, তাদের আয় কমে যাবে বলে। মহামারির জন্য লক ডাউনের সুযোগ নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার, 'দেশের প্রভু'দের রাজত্ব কায়েম করতে এই আইন জারি করল।

এক্ষেত্রে বিহারের উদাহরণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বিহারে ২০০৬

সালে এপিএমপি কার্যত বাতিল করে কৃষি পণ্যের অবাধ ব্যবসার অনুমতি দেওয়া হয়। সেসময় রাজ্য সরকার বলে, এজন্য নাকি চাষিদের অনেক আয় হবে। কিন্তু বাস্তবে দেখা গেল, চাষিরা আরো বেশি ফড়েদের জালে জড়িয়ে পড়ছে এবং প্রায় বাধ্য হয়েই নিয়ন্ত্রিণহীন বাজারে ন্যূনতম সহায়ক মূল্যের থেকে অনেক কমে ফসল বিক্রি করতে হচ্ছে। এরপর থেকে যতগুলি সরকারি ও বেসরকারি সমীক্ষা হয়েছে তাতে দেখা গেছে, বিহারে চাষিদের গড় আয় দেশের মধ্যে সবথেকে নীচে। কিন্তু যেখানে এপিএমসি বাজারে চাষিরা ফসল বিক্রি করতে পারছে, সেখানে চাষিদের গড় আয় বিহারের চাষিদের থেকে অনেকটাই বেশি। অনেক অর্থনীতিবিদ বলছেন, ফসলের দাম না পাওয়ার জন্য বিহারের চাষিরা চাষ ছেড়ে, দেশের অন্য জায়গায় মজুরি খাটার জন্য চলে যাচ্ছে বেশি আয়ের আশায়।

পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট আমলে রাজ্য সরকার কর্পোরেট পুঁজির স্বার্থে এপিএমসি আইন বদলের সিদ্ধান্ত নেয়। এ ব্যাপারে তাদের পরামর্শদাতা ছিল ম্যাকিনসে কোম্পানি। কিন্তু গণ আন্দোলনের চাপে তাতে সফল হয়নি সরকার। কিন্তু পরে তৃণমূল কংগ্রেসের সরকার ২০১৪ সালের ৮ ডিসেম্বর বিধানসভার একদিনের বিশেষ অধিবেশন ডেকে সংশোধিত এপিএমসি বিল পাশ করিয়ে নেয়। যা কেন্দ্রীয় সরকার ও কর্পোরেট পুঁজিকে বিশেষ আহ্লাদিত করে।

এখানে বলে রাখা ভালো, এপিএমসি আইন পশ্চিমবঙ্গের ছোট, প্রান্তিক চাষি বরাবরই বঞ্চিত হয়েছে। কারণ তাদের বেশিরভাগেরই এই বাজার ব্যবস্থায় অংশগ্রহণ করতে পারেনি। মূলত বড় চাষি-ব্যবসায়ী, ফড়ে এবং রাজনৈতিক নেতারা সিদ্ধান্ত গ্রহণে এবং নীতি নির্ধারণে ভূমিকা নিত। ফলে তারা নিজেদের ফায়দার জন্য কাজ করতো। নিয়ন্ত্রিত বাজার বলা হলেও ছোট এবং প্রান্তিক চাষি এখানে ওই তথাকথিত কমিটির ঠিক করা ক্ষেত্রে তাদের উৎপাদন বেচতে আসতো। এছাড়া অন্য কোনো ভূমিকা তাদের ছিল না। তা সত্ত্বেও

এই ব্যবস্থায় চাষিদের একটি নির্দিষ্ট দামে ধান, সরষে,পাট ইত্যাদি ফসল বিক্রির একটা সুযোগ ছিল। কিন্তু নিয়ন্ত্রণহীন বাজারে চাষিদের কর্পোরেটের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়ার জন্য ছেড়ে দেওয়া হল। পরোক্ষে বলা হল, যদি তুমি টিকতে পারো তো ভালো। না হলে কর্পোরেটের ঠিক করা শর্তে চুক্তি চাষ করো, অথবা মরো।

আমরা আগেই বলেছি, চাষি এবং ব্যবসায়ীর মধ্যে কোনো বিরোধ তৈরি হলে তা নিষ্পত্তির জন্য সাব ডিভিসনাল ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে সালিশী মীমাংসার জন্য আবেদন করা যাবে। এর জন্য এসডিএম একটি সালিশী বোর্ড তৈরি করবে। আর এই বোর্ড যে রায় দেবে তা কোনো দেওয়ানি আদালতে চ্যালেঞ্জ করা যাবে না। এছাড়া আইনটির কোনো কিছুই এপিএমসি বা অন্য কোনো আইনে চ্যালেঞ্জ করা যাবে না। বিরোধ মীমাংসার রায় দেওয়ার ক্ষেত্রে, চুক্তি লঙ্ঘনের অভিযোগ প্রমাণ হলে, এসডিএম অর্থ আদায়ের আদেশ দেবে। জরিমানা ধার্য করবে। তারা বিতর্কিত ব্যবসায়ীকে ব্যবসা বন্ধের নির্দেশও দিতে পারে। এসডিএমএর রায় পছন্দ না হলে, অ্যাপলেট অথরিটির হিসেবে জেলা কালেক্টর বা অ্যাডিশনাল কালেক্টরের কাছে আবেদন করা যাবে। সেই রায়ও পছন্দ না হলে কেন্দ্রীয় সরকারের যুগ্ম সচিব পর্যায়ের অফিসার, যাকে দায়িত্ব দেওয়া হবে তার কাছে আবেদন করতে হবে।

আমরা জানি, ব্যক্তি, সংস্থা, সরকার ইত্যাদি আইন না মানলে আদালতে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য মামলা করা যায়। কিন্তু এই আইনে সে পথও বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এখানে বিরোধের মীমাংসা করবে সরকারি বাবুরা। আর তারা কাদের স্বার্থে সিদ্ধান্ত নেয় তা আমরা সকলেই জানি।

সারা ভারত জুড়েই চাষিরা দাবি করছে, নতুন আইনে ন্যূনতম সহায়ক মূল্য দিয়ে চাষিদের থেকে ফসল কেনার গ্যারান্টি আইনে দেওয়া হোক। আইনে এই গ্যারান্টি দেওয়া হলে কোনো বাজারেই ন্যূনতম সহায়ক মূল্যের কমে কেউ ফসল কিনতে পারবে না। এতে

চাষির ক্ষতির সম্ভাবনা অনেকটাই কমবে। সরকার বলছে, ন্যূনতম সহায়ক মূল্যে ফসল কেনার ব্যবস্থা চালু থাকবে। কিন্তু আইনে বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করছে না। ফলে সরকারের অন্যান্য মৌখিক সংকল্পের মতো একথাটিও একটা ফাঁকা বুলি হিসেবে চিহ্নিত হবে।

ফসলের দামের নিশ্চয়তা এবং কৃষি পরিষেবা ক্ষেত্রে চাষির ক্ষমতায়ন এবং সুরক্ষা চুক্তি আইন

তৃতীয় আইনটি হল দ্য ফার্মার্স (এমপাওয়ারমেন্ট অ্যান্ড প্রোটেকশন) এগ্রিমেন্ট অন প্রাইস অ্যাসিওরেন্স অ্যান্ড ফার্ম সার্ভিসেস বা ফসলের দামের নিশ্চয়তা এবং কৃষি পরিষেবা ক্ষেত্রে চাষির (ক্ষমতায়ন এবং সুরক্ষা) চুক্তি আইন ২০২০। এর উদ্দেশ্য সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকার বলছে, ভারতে মূলত ছোট জোতের সংখ্যাই বেশি। এছাড়া রয়েছে অনিশ্চিত আবহাওয়া, উৎপাদনের অনিশ্চতা এবং বাজারের অনিশ্চয়তার মতো দূর্বলতা। এসব কৃষিকে সব দিক থেকেই ঝুঁকিপূর্ণ করে তুলেছে।

এই আইনটি চাষিদের কোনো শোষণের আশঙ্কা ছাড়াই বিভিন্ন ধরনের ব্যবসায়ীদের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার সুযোগ এবং ক্ষমতা দেবে। এই ব্যবসায়ীরা হল, প্রসেসর, পাইকার, অ্যাগ্রিগেটর, বড় খুচরা ব্যবসায়ী, রফতানিকারী ইত্যাদি। ফলে ছোট জোতের চাষিদের বিভিন্ন ঝুঁকি কমবে এছাড়া ব্যবসায়ীদের সঙ্গে চুক্তির ফলে চাষি বিভিন্ন আধুনিক প্রযুক্তি এবং চাষের জন্য দরকারি ইনপুট বা ইন্ধন যেমন সার, বিষ, বীজ পেতে সক্ষম হবে। ব্যবসায়ীরা যেহেতু আগে থেকেই চুক্তিবদ্ধ থাকবে, তাই চাষিদের বিপণনের ব্যয় কমবে এবং তাদের আয় বাড়বে। সরকার বলছে, এই আইনটির ফলে কৃষি বাজার ব্যবস্থা অনেক সুশৃঙ্খল হবে। এতে বেসরকারি এবং বিদেশি বিনিয়োগ কৃষিতে বাড়বে। ফলে চাষিরা উচ্চমানের প্রযুক্তি এবং কৃষি পরামর্শের সুযোগ পাবে।

সরকারের আরো বক্তব্য, এর ফলে চাষিরা সরাসরি বিপণন

করতে পারবে, ফলে মধ্যস্থতাকারী (ফড়ে, দালাল) দের দৌরাত্ম কমে চাষিদের আয় বাড়বে। এখানে চুক্তির ফলে চাষিদের জমি বিক্রি, লিজ বা বন্ধক সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এরকম ঘটনা ঘটলে চাষিদের জমি পুনরুদ্ধারের ব্যবস্থাও এই আইনটিতে রয়েছে। এছাড়া নির্দিষ্ট সময়সীমার জন্য কার্যকরী বিরোধ নিষ্পত্তি ব্যবস্থাও রাখা হয়েছে।

আইনটিতে ফার্ম সার্ভিসেস বলতে, বীজ, গো-খাদ্য, কৃষি রাসায়নিক, যন্ত্রপাতিসহ সমস্ত ইনপুটকে বোঝানো হয়েছে। ফার্মিং এগ্রিমেন্ট বলতে, চাষি ও স্পনসরের মধ্যে, চাষি, স্পনসর ও তৃতীয় পক্ষের মধ্যে নির্ধারিত গুণমান সম্পন্ন ফসল, নির্ধারিত দামে কেনার লিখিত চুক্তিকে বোঝানো হয়েছে। এরই সাথে যুক্ত হয়েছে ট্রেড অ্যান্ড কমার্স এগ্রিমেন্ট বা বাণিজ্য চুক্তি। যেখানে বলা হয়েছে, উৎপাদনের ধার্য সময়সীমার মধ্যে পণ্যের মালিক বা চাষি চুক্তি অনুযায়ী মাল সরবরাহ করলেই দাম পেয়ে যাবে। একইসঙ্গে প্রোডাকসন এগ্রিমেন্ট বা উৎপাদন চুক্তির ক্ষেত্রে বলা হয়েছে, স্পনসরকে পূর্ণ কিম্বা আংশিকভাবে ফার্ম সার্ভিস বা কৃষি পরিষেবা দিতে হবে এবং উৎপন্ন ফসলের (আউটপুট) ঝুঁকি নিতে হবে। তবে এই পরিষেবা বলতে কী তা বলা হয়নি। চুক্তিতে বাধ্যতামূলক পরিস্থিতিগত কারণে - যেমন প্রাকৃতিক বিপর্যয় বা অন্যান্য জরুরি ঘটনায় (যুদ্ধ ইত্যাদির কারণে) চুক্তি বাতিল করার নিদান দেওয়া হয়েছে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে যেখানে ফার্মিং এগ্রিমেন্ট সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা আছে সেখানে বলা হয়েছে, এই ধরনের পরিষেবা দেওয়ার ক্ষেত্রে আইনগত প্রয়োজনের দায় মেটানোর ভার থাকবে স্পনসর বা সার্ভিস প্রোভাইডারের হাতে। আর এই পরিচ্ছদের ধারা ২-এ বলা হয়েছে, ভাগচাষির অধিকার ক্ষুন্ন করে চাষি কোনো চুক্তি করতে পারবে না।

চুক্তির মেয়াদ সম্পর্কে বলা হয়েছে, একটা ফসল ওঠার মরশুম

(ক্রপ সিজন)। যেখানে উৎপন্ন ফসল সংগ্রহের উপযোগী হতে সময় লাগে — এমন ক্ষেত্রে সর্বাধিক ৫ বছর পর্যন্ত চুক্তিটি বলবৎ থাকতে পারে। আর ফসলের গুণমানে নজরদারি ও সংশাপত্র দেওয়ার জন্য তৃতীয় পক্ষ হিসেবে যোগ্যতাসম্পন্ন পরীক্ষক নিযুক্ত হতে পারে।

বীজ ছাড়া অন্য ফসলের ক্ষেত্রে, ফসল সরবরাহ করার ৪৮ ঘন্টার মধ্যে স্পনসরকে দাম মেটাতে হবে। বীজের ক্ষেত্রে, দিনের দিন দুই তৃতীয়াংশের দাম মেটাতে হবে, বাকিটা সংশাপত্র পাওয়ার পর (সরবরাহের ৩০ দিনের মধ্যে) মেটাতে হবে। এসবই খুব ভালো কথা যেমন আইনে লেখা থাকে। কিন্তু এর ভেতরের উদ্দেশ্য কী এবার তা বুঝে নেওয়া যাক।

ভারতের কর্পোরেটদের চুক্তি চাষ চালু করার প্রবণতা বহুদিন ধরেই রয়েছে। সমস্ত সরকারই কৃষিকে শিল্পে পরিণত করার লক্ষ্যে চেষ্টা চালিয়েছে। এর প্রধান কারণ কৃষিক্ষেত্রে সরকারের বিনিয়োগ কমানো। আর কৃষিতে যেহেতু বিনিয়োগের প্রয়োজন, তাই কর্পোরেট সেই স্থান পূরণ করবে। কৃষির প্রাথমিক ইন্ধন থেকে শুরু করে উৎপাদন, বাজার, রফতানি সম্পূর্ণ ব্যবস্থাটি কর্পোরেটের হাতে চলে যাবে। ২০০৭ সালে সই করা ইন্দো-আমেরিকান কৃষি জ্ঞান চুক্তির মূল বিষয়গুলির মধ্যে চুক্তি চাষ এবং কৃষির কোম্পানিকরণ অন্যতম। তবে যেহেতু এখনো কৃষিকাজের সঙ্গে বেশিরভাগ মানুষ জড়িত, তাই সরকারগুলি, ভোট হারানোর ভয়ে, বিভিন্ন সময়ে নানা চকচকে মোড়কে চুক্তিচাষ বা চাষের কোম্পানিকরণ করতে চেয়েছে। কারণ চাষি চটে গেলে গদি উল্টে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। আমাদের রাজ্যেও বর্তমান সরকার নামের হেরফের করে চুক্তি চাষের অনুমোদন দিয়ে রেখেছে বাই ব্যাক অ্যারেঞ্জমেন্ট নামে। এখানে বলে রাখা ভালো, বিভিন্ন উপায়ে উৎপাদক এবং বিক্রয়কারী সমবায় কোম্পানিগুলির সঙ্গে বহুদিন ধরেই চুক্তি চাষ চলে আসছে।

এই আইনটিতে যে বিষয়গুলি উল্লেখ করা হয়েছে তাতে খুব পরিষ্কার করে কিছু বোঝা যাচ্ছে না। আর সেই কারণে বেশ কিছু

প্রশ্নগুলি উঠে আসছে। চাষ তো চাষি করবে তার জমিতে। সেক্ষেত্রে চাষি কোনো সংস্থার সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হলে সে কি নিজের ইচ্ছে মতো ফসল চাষ করতে পারবে? মনে হয় না। কারণ বিনিয়োগকারী সংস্থা উৎপাদিত ফসলে যদি লাভ না দেখতে পায় তবে কেন তারা বিনিয়োগ করবে! আর এই লাভের জন্যই তো তারা চুক্তি করছে। অর্থাৎ চাষ হবে ওই সংস্থার মর্জি মাফিক। যদি তাই হয়, তবে চাষির জমি যে ব্যবহার করা হবে তার ভাড়া ও সুদ, জল, বীজ, সার-বিষ, শ্রম, ফসলের বিমা ইত্যাদির খরচ ধরে ফসলের দাম ঠিক করা হবে তো? কারণ আইনে এসব পরিষ্কার করে কিছু বলা নেই।

এখানে আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হল, বিনিয়োগকারী সংস্থাগুলি তাদের লাভের জন্য বিঘার পর বিঘা একই ফসলের চাষ করতে চাইবে। কারণ অল্পস্বল্প জমিতে চাষ করলে তাদের পোষাবে না। আর এইভাবে চাষ হলে ফসলের সংখ্যা কমবে। সব ধরনের জমিতে একই ফসলের চাষ করলে বিষ, সার, জল ইত্যাদির ব্যবহার বাড়বে। ফলে মাটি, জল, আবহাওয়া বিষাক্ত হবে। উপকারি গাছ-গাছড়া, অণুজীব, প্রাণী, পশুপাখি মারা পড়বে। এক কথার জীব বৈচিত্র নষ্ট হবে। এছাড়া মানুষের স্বাস্থ্যের সমস্যা দেখা দেবে। এসবের ক্ষতিপূরণ সংস্থাগুলি কীভাবে করবে ?

আইনটিতে বলা হয়েছে, ভাগচাষির অধিকার ক্ষুন্ন করে চাষি কোনো চুক্তি করতে পারবে না। তবে নথিভুক্ত বর্গাদার, ভাগচাষি বা যিনি অন্যের জমিতে চাষ করেন অথবা নথিভুক্ত নয় এরকম ভাগচাষিদের সঙ্গে মালিকদের আয় কী হারে বন্টিত হবে তার কোনো উত্তর এখানে নেই। সিঙ্গুরে জমি অধিগ্রহণের সময় দেখা গিয়েছিল, প্রায় ৮০ শতাংশেরও বেশি জমির মালিক নিজের জমিতে চাষ করে না। চাষ করে ভাগচাষি। রাজ্যের সর্বত্রই সেচসেবিত তিন বা চার ফসলি কৃষি এলাকাগুলিতে অনুপস্থিত জমি মালিকদের সংখ্যা এরকমই। কিন্তু চুক্তিতো মালিকের সঙ্গে হবে। সেক্ষেত্রে অর্থের বন্টন বিনিয়োগকারী সংস্থা না মালিক চাষি, কে করবে? এই চুক্তি চাষের

ফলে বর্গাদারদের চাষ থেকে উৎখাত করা হবে না তো? পশ্চিমবঙ্গসহ অন্যান্য রাজ্য যেখানে ভূমি সংস্কার হয়েছে সেখানে এই সমস্যার সমাধান কীভাবে করা হবে? উল্লেখ্য পশ্চিমবঙ্গে ২০১৬ সালে বাইব্যাক অ্যারেঞ্জমেন্টের নামে চুক্তি চাষ চালু হলে এবং সংবাদপত্রগুলি এই চাষের ভূয়সী প্রশংসা করলেও এখনো অবধি রাজ্যের মোট জমির খুব সামান্য অংশে এভাবে চাষ হচ্ছে। এর প্রধান কারণগুলির মধ্যে অন্যতম, জমির মালিক চাইলেও ভাগচাষিদের চুক্তিচাষে আপত্তি ।

অন্য আরো একটি বিষয় হল, চুক্তি চাষের জমিতে যারা মজুরি করবে তাদের কী হারে মজুরি দেওয়া হবে। সরকারি হিসেবে মজুরি অদক্ষ, আধা দক্ষ, দক্ষ শ্রমিক হিসেবে ধরা হয়। তাদের মজুরিও কমবেশি হয়। যদিও এই হিসেব চাষের কাজে খুব একটা চালু নেই। কিন্তু এই চাষ হবে আইন মাফিক। কৃষির শিল্পায়ন হবে। তাই স্বাভাবিকভাবেই মজুরিও শিল্পের নিয়মেই হওয়া উচিত। এজন্য কৃষি শ্রমিকেরা কোন কাজের জন্য কোন ধরনের শ্রমিক হিসেবে গণ্য হবে তাও নির্ধারণ করতে হবে। এটা কে করবে? বিভিন্ন শিল্পের কাজের জন্য শ্রম কমিশন মজুরি ঠিক করে। চুক্তি চাষের ক্ষেত্রেও কি এরকম কোনো ব্যবস্থা তৈরি হবে ?

আমাদের রাজ্যে প্রান্তিক ও ছোট জোতের সংখ্যা বেশি। এখানে একজন প্রান্তিক বা ছোট চাষি কখনো অর্থের বিনিময়ে বা কখনো নিজেদের শ্রমের বিনিময়ে একে অন্যের জমিতে মজুরি করে। চুক্তি চাষে কী এই ব্যবস্থা চলবে? চললে কীভাবে তা পরিচালনা হবে। কারণ পরের প্রশ্নটি এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ। চুক্তি চাষে নিয়োজিত মজুরেরা নিয়ম মতো বিনিয়োগকারী সংস্থার কর্মী। সে মজুরদের দুর্ঘটনার জন্য ক্ষতিপূরণ, তাদের বিমা ইত্যাদি হিসেব মতো বিনিয়োগকারী সংস্থার দায়িত্ব। যদি তা না হয় তবে তাদের জন্য ব্যয়ের অর্থ ফসলের দামের সঙ্গে ধরা দরকার। যাতে চুক্তি চাষে যুক্ত চাষি বা চাষিদের সংস্থা এই খরচ করতে পারে। এসবের কিছু

নিয়মকানুন কীভাবে হবে তা আইনে কোথাও উল্লেখ করা নেই।

এই চাষে ফসলের দামের হিসেব কীভাবে কষা হবে তা নিয়েও কোনো সদুত্তর নেই। এম এস স্বামীনাথন কৃষি কমিশনের রিপোর্ট অনুযায়ী ফসলের উৎপাদন খরচের মোট দামের ৫০ শতাংশ বেশি ধরে তা ন্যূনতম সহায়ক মূল্য ঠিক করার কথা বলে। যেখানে চাষের যাবতীয় খরচ ধরার কথা বলা হয়েছিল (এমনকি জমির ভাড়া, চাষের জন্য নেওয়া ঋণ এবং তার সুদ ইত্যাদিও ধরার কথা ছিল)। সে হিসেব কী এক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে? যদি কোনো নিয়ম তৈরি না থাকে, তবে কী আবার ফড়েদের মতো চাষির দাম ঠিক করার দায় বিনিয়োগকারী সংস্থা ইচ্ছার ওপরই ছেড়ে দেওয়া হল না? প্রশ্ন অনেক, উত্তর নেই।

আমরা এ রাজ্যে আলু নিয়ে হুগলি এবং বর্ধমান জেলায় চুক্তি চাষের ওপর সমীক্ষা করেছিলাম। তাতে দেখা গেছে, বিনিয়োগকারী সংস্থা তাদের চিপস তৈরির জন্য বিশেষ ধরনের আলুর বীজ দিত চাষিদের এবং নির্দিষ্ট মাপের আলুই তারা কিনত। তার থেকে ছোট মাপের হলে নিত না। এই ছোট মাপের আলু বাজারে বিক্রি হত না কারণ এর গুণমান সাধারণ আলুর থেকে খারাপ। ফলে তা জমিতেই নষ্ট হত। সেই কারণে প্রশ্ন, উৎপাদিত ফসলের সবটাই কি বিনিয়োগকারী সংস্থা নিয়ে নেবে? কারণ চাষ এবং ফসল উৎপাদন বিভিন্ন বিষয় যেমন, জমি, জল, রোদ-হাওয়া, বীজ ইত্যাদির ওপর নির্ভর করে। কোনো কারণে ফসল চাষ ও উৎপাদনে ক্ষতি হলে তার দায় কে নেবে?

রাজ্য সরকারের বাইব্যাক অ্যারেঞ্জমেন্ট অনুযায়ী চুক্তি চাষিদের এফপিও বা ফার্মার্স প্রোডিউসার অরগানাইজেশনের সঙ্গে করতে বলা হয়েছে, ব্যক্তি চাষির সঙ্গে নয়। এর যুক্তি ছিল, এ রাজ্যে ৯৫ ভাগ চাষিই ছোট এবং প্রান্তিক। চাষিদের জোট হলে তাদের দরদাম করার ক্ষমতা বাড়বে। ফলে আয় বাড়বে। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারের এই আইনে এরকম কোনো বাধ্যবাধকতার কথা নেই। তাহলে কি ব্যক্তি

চাষিদের সঙ্গে চুক্তি করে চাষ করা যাবে। এক্ষেত্রে এইসব চাষিদের সঙ্গে বৃহদায়তন কর্পোরেটের চুক্তি কি সুরক্ষিত থাকবে। দ্বিতীয়ত, চুক্তি চাষের আইনে বলা হয়েছে কোর্টে নয় আমলাদের মাধ্যমে দ্বন্দ্ব সমাধান করতে হবে। আমলাতন্ত্রের সঙ্গে কর্পোরেটের সখ্য এদেশে বহুল প্রচলিত। এই ব্যবস্থায় কী তবে চাষিদের স্বার্থ সুরক্ষিত রাখতে পারবে?

এখনো অবধি তিনটি নতুন আইনের আলোচনা আমরা করলাম। কিন্তু চাষের কোম্পানিকরণের উদ্দেশ্যের সঙ্গে আরো কয়েকটি বিষয় জড়িয়ে রয়েছে। করোনাকালে উদ্ভুত পরিস্থিতির জন্য প্রধানমন্ত্রী গত ১২ মে ঘোষণা করেন ২০ লক্ষ কোটি টাকার প্যাকেজ। পরে ১৫ মে অর্থমন্ত্রী কৃষিক্ষেত্রে ১ লক্ষ কোটি টাকার প্যাকেজ ঘোষণা করেন। এর মধ্যে বেশিরভাগটাই এ বছরের বাজেট ঘোষণার সময় বলা হয়েছিল (অর্থহীন কৃষি বাজেট-মার্চ ২০২০ — কিষান স্বরাজ সমিতির প্রকাশিত বই ৬ নং পুস্তিকা দেখুন)। এছাড়া অতিরিক্ত বরাদ্দ হিসেবে কয়েকটি তহবিল তৈরির কথাও বলা হয় কৃষির বিভিন্ন খাতে ঋণ দেওয়ার জন্য। এর সঙ্গে আইন হিসেবে না বললেও এপিএমসি, উন্মুক্ত কৃষি বাজার এবং চুক্তি চাষের কথাও বলেছিলেন অর্থমন্ত্রী। সরকার মনে করে, এতে নাকি অর্থব্যবস্থায় নতুন উদ্দীপনা আসবে। কিন্তু জুলাই মাসে দেখা গেল ভারতের জিডিপি বা গড় আভ্যন্তরীণ উৎপাদন বৃদ্ধি কমে হয়েছে-২৩.৯ শতাংশ।

এবার আসা যাক কৃষি ঋণ প্রসঙ্গে। সাধারণত তিন রকমের কৃষি ঋণ দেওয়া হয় চাষবাস, কৃষি পরিকাঠামো তৈরি আর কৃষি সহায়তা ব্যবস্থা তৈরির ক্ষেত্রে। কৃষি ক্লিনিক, কৃষি ব্যবসার কেন্দ্র তৈরির সহায়তামূলক ঋণের মধ্যে পড়ে। এর জন্য ১০০ কোটি টাকা অবধি ঋণ পাওয়া যায়। আর একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, কৃষি ঋণ ৪ শতাংশ হারে পাওয়া যায়। এবারে কৃষি ঋণের স্বরূপটি একটু দেখে নেওয়া যাক।

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়ার পেশ করা তথ্য থেকে জানা যাচ্ছে, এনডিএ সরকার ক্ষমতায় আসার পরে ২০১৫ সালে ৬০৪টি অ্যাকাউন্টে মোট ৫২ হাজার ১৪৩ কোটি টাকা ঋণ দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ গড়ে প্রতিটি অ্যাকাউন্টে ৮৬.৩৩ কোটি টাকা ঋণ দেওয়া হয়েছে। একইভাবে ২০১৬ সালে ৬১৫ টি অ্যাকাউন্টে মোট ৫৮ হাজার ৫৬১ কোটি টাকা ঋণ দেওয়া হয়েছে। এ বছরেও গড়ে প্রতিটি অ্যাকাউন্টে ৯৫ কোটি টাকা ঋণ দেওয়া হয়েছে।

একবার ভেবে দেখুন আপনার আশেপাশে ৯৫ কোটি টাকা ঋণ নেওয়ার মতো কজন চাষি আছে? আমরা জানি কেউ নেই। আর একথাও সবার জানা, সস্তা সুদের এই কোটি কোটি টাকা ঋণ কারা পেয়েছে। তবে একথাও সত্যি অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে দু-দশ হাজার টাকার ঋণ চাষিরা পেয়েছে।

কৃষি তহবিলের নামে যে যে খাতে ঋণ বরাদ্দ করা হবে বলে বলা হচ্ছে, তা বর্তমান আইনগুলিতে বলা কৃষি সহায়তার ঋণের সঙ্গে

সামঞ্জস্যপূর্ণ। মূলত বড় কৃষি পরিকাঠামো তৈরি, সংরক্ষণ, পরিবহন, প্রক্রিয়াকরণ, কৃষি ক্লিনিক ইত্যাদির জন্য এই ঋণ দেওয়া হবে। ফলত এসব ঢুকবে কর্পোরেটের ঘরে। চাষির নাম করে সরকার ঋণের কথা বললেও, কর্পোরেটের কৃষি ব্যবসাকে সমৃদ্ধ করার জন্যই এই ঋণ, বিমা, করের খেলা এখন চলছে।

শেষের কথা

কৃষির কর্পোরেটকরণে, তিনটি কৃষি আইনের ফলে চাষ এবং চাষিদের সম্ভাব্য ক্ষতিগুলির সম্পর্কে আমরা বিশদে আলোচনা করলাম আমাদের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে। দেশের গরিব মানুষজনের খাদ্য নিরাপত্তায় এই আইনের বিরূপ প্রভাব নিয়েও আমরা বিশ্লেষণ করেছি। কিন্তু ক্রেতা বা উপভোক্তা যারা বাজারের অন্যতম স্তম্ভ তারা কি এই আইনের ফলে লাভবান হবে? এক্ষেত্রেও আমাদের উত্তর না। এটা মনে রাখা দরকার বাজারে সব ক্রেতাই সমান। কারণ বড়লোক-গরিব, রাষ্ট্রপতি-ভিখারি সবার জন্যই কোনো একটি সামগ্রীর দাম সমান। আমরা আগেই বলেছি, এই আইনগুলির মাধ্যমে মজুতদারি কালোবাজারি বাড়বে সরকারই মদতে এবং আমাদের পয়সায়। কারণ হিমায়িত সংরক্ষণ, পরিবহন ব্যবস্থা, সাপ্লাই চেন ম্যানেজমেন্টসহ বিভিন্ন কাজে কম সুদে ঋণ এবং ভরতুকি দেওয়া হবে। তারা এসব পেয়ে, মজুতদারি বাড়িয়ে, বাজারে কৃষি সামগ্রীর কৃত্তিম অভাব তৈরি করবে। পরে বেশি দামে সেগুলি বিক্রি করবে। সরকার দামের নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রেও হাত তুলে নিয়ে বলেছে, কোনো জিনিসের দাম ১০০ ভাগ বাড়লে তবে তারা চিন্তা করবে মজুতদারি নিয়ন্ত্রণ করবে কিনা। ফলত নিয়ন্ত্রণহীন বাজার জিনিসপত্রের দাম বাড়বে এবং তার খেসারত দিতে হবে ক্রেতাকে।

কর্পোরেটের দাম বাড়ানোর খেলা বুঝতে বছর তিনেক আগে শুরু হওয়া মোবাইল ফোন লাইনের উদাহরণ এক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক হবে। ২০১৬'র সেপ্টেম্বরে এই ফোন লাইনের সংযোগ ৯৯ টাকার

বিনিময়ে দেওয়া শুরু হয়েছিল। ২০১৯ সালের ৩১ ডিসেম্বরে এসে দেখা গেল তাদের গ্রাহক সংখ্যা হয়ে গেছে প্রায় ৩৯ কোটি। আর এর মধ্যে ৩৩৬ দিনের একই সংযোগের দাম হল ২১২১ টাকা। সাময়িক বিনামূল্যের সংযোগের জন্য অন্য ফোন লাইনের কোম্পানিগুলি প্রচুর গ্রাহক খোয়াল। কয়েকটি কোম্পানি বন্ধ হয়ে গেল। এখন সরকারি বিএসএনএল কোম্পানি বন্ধ হওয়ার মুখে। প্রধানমন্ত্রীর ছবি দিয়ে যোগাযোগের জগতে বিপ্লব আনার সস্তা ফোন লাইনের কোম্পানি, গত কিছুদিনে কয়েকবার দাম বাড়ালেও সরকার নিশ্চুপ। আমরা যাকে একচেটিয়া ব্যবসা বা মোনোপলি বলি, ফোন লাইনের ক্ষেত্রে তা শুরু হয়ে গেছে। এখন বিকল্প কম থাকায় গ্রাহক কোম্পানির স্থির করা বেশি দাম দিতে বাধ্য।

সরকার কৃষি আইনগুলি প্রণয়নের উদ্দেশ্য হিসেবে বলেছে, এতে জিনিসপত্রের দাম কমবে। ক্রেতাদের লাভ হবে। কিন্তু একথা হলফ করে বলা যায়, কয়েকটি কর্পোরেটের একচেটিয়া ব্যবসায় কৃষিপণ্যের দাম বাড়বে। ফলে চাষি ছাড়াও বহু ছোট ব্যবসায়ী, প্রক্রিয়াকারী, কৃষি ব্যবসায় পরিষেবা যারা দেন, তারাও কর্মচ্যুত হবে।

সমগ্র লেখাটির সংক্ষিপ্তসার হিসেবে পরিশেষে ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২০ তে আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত প্রখ্যাত সাংবাদিক - সম্পাদক অনির্বাণ চট্টোপাধ্যায়ের লেখা - পূর্ণ স্বরাজ আগত ওই- অর্থনীতিকে কর্পোরেট পুঁজির হাতে তুলে দেওয়ার বিষম তাড়া, দিয়ে লেখাটি শেষ করছি।

নিমাই রায় সমাজতত্ত্বেও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পান ১৯৮৮ সালে, তারপর চাষবাসে মন দেন। তিনি কৃষক হতে চেয়েছিলেন। এখন ওড়িশার জাজপুরে ১২ একর জমিতে বছরে একাধিক ফসল ফলান। দ্য টেলিগ্রাফ পত্রিকায় (২২-৯) তাঁর কথা পড়লাম। কৃষিপণ্য সংক্রান্ত আইন সংশোধন নিয়ে তাঁর বক্তব্য, এর ফলে ক্রমশ কৃষির নিয়ন্ত্রণ চলে যাবে বড় মাপের কারবারিদের হাতে, তাঁরা ঠিক করবেন

জমিতে কী ফসল ফলানো হবে। ‘‘যে কৃষকের একদিন নিজের জমি ছিল তিনি সেই জমিতেই মজুর খাটবেন’’। চাষি দেখবেন, তাঁর স্বাধীনতা কেড়ে নেওয়া হয়েছে, তিনি একটা কোম্পানির শ্রমিকে পরিণত হয়েছেন।

কথাটা নানা প্রশ্ন ওঠাতে পারে। জন্মজন্মান্তর কৃষি জমিতে বাঁধা পড়ে থাকাটা স্বাধীনতা? এই আইনের ফলে যদি জমি বিক্রি করে অন্য পেশায় যাওয়ার প্রবণতা বাড়ে, তাতেই তো স্বাধীনতার প্রসার ঘটবে। জীবিকা নির্বাচনের স্বাধীনতা। আর, সরকার তো চাষিকে জমি বেচতে বলছে না! নতুন আইন বরং বলছে ঃ কৃষক নিজের ফসল যাকে খুশি যেখানে খুশি বিক্রি করতে পারবেন, সরকার-নিয়ন্ত্রিত ‘মান্ডি’ তে বিক্রির বাধ্যবাধকতা থাকবে না এবং সুযোগ পেলে যে কোনও কোম্পানির সঙ্গে চুক্তি করতে পারবেন, কী ফসল ফলাবেন, তার কী দাম পাবেন, সবই চুক্তিতে থাকবে। এতেও আপত্তি?

সরকারি বয়ানেরও কৃষকের স্বাধীনতার জয়ধ্বনি। প্রধানমন্ত্রী অভিযোগ করেছেন, কৃষিপণ্য বিপণন কমিটি (এপিএমসি) তথা সরকার অনুমোদিত মান্ডি ও তার মাতব্বরদের শৃঙ্খল থেকে মুক্ত হয়ে কৃষক ফসল বিক্রির স্বাধীনতা পেলে দালালদের প্রভুত্ব চলে যাবে, বিরোধীরা সেটা মানতে পারছেন না, কারণ তাঁদের কায়েমি স্বার্থও স্থিতিবস্থার সঙ্গে জড়িত। সরকারি ‘বিশেষজ্ঞ’রা নব্বইয়ের দশকের আর্থিক সংস্কারের প্রসঙ্গ তুলে বলেছেন, এতদিনে ভারতীয় কৃষিও উদার অর্থনীতির মুক্তাঙ্গনে দাঁড়ানোর সুযোগ পেল, কৃষক অবশেষে স্বাধীনতার স্বাদ পাবেন।

ষাটের দশকে তৈরি এপিএমসি নিয়ে বিস্তর সমালোচনা। মান্ডির পরিসরে দালালেন দাপট সত্যই প্রবল। অন্যদিকে, অধিকাংশ কৃষক সেই পরিসরের বাইরেই থেকে গেছেন—বহু এলাকাতেই ছোট এবং

মাঝারি চাষিরা আজও প্রধানত স্থানীয় মহাজন আড়তদার ইত্যাদি ক্ষমতাগোষ্ঠীর ওপর নির্ভরশীল, প্রায়শই তাদের কুক্ষিগত। কীভাবে এই ব্যবস্থার সংস্কার করে ক্ষমতাবানদের কবল থেকে চাষিদের মুক্ত করা যায়, সে-সব নিয়ে অনেক চিন্তাভাবনা হয়েছে, সুপারিশের স্তূপ জমেছে, রাজনীতি এবং আমলাতন্ত্রের স্বার্থ সেগুলির রূপায়ণ হতে দেয়নি। আজ যাঁরা কৃষি বিল সংশোধনের বিরোধীতায় সরব, তাঁদের অনেকেই সেই স্বার্থের প্রতিভূ, তাঁরা যখন ক্ষমতায় ছিলেন তখন প্রয়োজনীয় সংস্কার হয়নি।

কিন্তু নরেন্দ্র মোদীরা যেটা চাইছেন, তার নাম সংস্কার নয়, বিসর্জন। তাঁদের বিধান হল — সাংবাদিক তথা সমাজকর্মী পি সাইনাথের ভাষায়—'অসুখ করেছে? মেরে ফেলো।' সরকার অবশ্যই এ কথায় ঘোর আপত্তি জানাবে। তাদের প্রচারকরা বড় গলায় বলছেন, এপিএমসি তুলে দেওয়া হচ্ছে না। মান্ডিও থাকবে, চাষিরা ইচ্ছে করলে সেখানেও ফসল বিক্রি করতে পারবেন। কিন্তু আমরা জানি, সরকারি দোকান বন্ধ না করেও কীভাবে তার সর্বনাশ করে দেওয়া যায়। ওষুধ উৎপাদন থেকে শুরু করে টেলিফোন পরিষেবা অবধি নানা ক্ষেত্রে তার বিস্তর নমুনা আমরা দেখেছি, দেখছি। এমনকি ভারতীয় রেলও এখন সে-পথেই চলেছে। তাই সরকারি প্রচারকদের আশ্বাসের দম ক'পয়সা, সেটা কারও অজানা নয়। তেমনই, কৃষিপণ্যের ন্যূনতম সহায়ক মূল্য (এমএসপি) নিয়ে আশ্বাসের কমতি নেই, কিন্তু নয়া ব্যবস্থায় এমএসপি'র কতটুকু কার্যকারিতা অবশিষ্ট থাকবে, তা নিয়ে ঘোরা সংশয়।

কিন্তু মূল প্রশ্ন এপিএমসি বা মান্ডি নিয়ে নয়, মূল প্রশ্ন একটি ধর্মমত নিয়ে যে বলে বাজারের হাতে সব কিছু ছেড়ে দিলেই স্বাধীনতা মিলবে। আশির দশকেই এই ধর্মপ্রচার জোরদার হয়। দিল্লির তখ্‌তে সেই মতাদর্শের প্রতিষ্ঠা নব্বইয়ের গোড়ায়, মোদীর রাজত্বে তার পালে জোর হওয়া লাগে, অতিমারির কালে সে-হাওয়া ঝড়ের রূপ নিয়েছে। আমাদের থালা বাটি বাজানোর অবকাশে দেখতে দেখতে

কয়লাখনিতে বেসরকারি পুঁজির প্রবেশ অবারিত হয়েছে, তাকে স্বাগত জানানো হয়েছে রেলপথেও, আরও বহু পুঁজিমালিকের হাতে শ্রমিক ছাঁটাইয়ের অবাধ অধিকার তুলে দেওয়া হয়েছে, এবার এপিএমসি'র নিয়ন্ত্রণ সরিয়ে নিয়ে ও চুক্তিচাষে অনুমোদন দিয়ে কৃষিপণ্যের বাজারও খুলে দেওয়া হল, অত্যাবশ্যক পণ্য মজুত করতেও আর বাধা থাকল না, এমনকি জানিয়ে দেওয়া হল যে, চাল-ডাল-আলু-পেঁয়াজের দামও 'যথেষ্ট' না বাড়লে বাজারে হস্তক্ষেপ করা হবে না। শাসক দল যে বেপরোয়া বিক্রমে কাঁড়ি কাঁড়ি বিল পাশ করিয়ে ছেড়েছে, তাতে অবাক হওয়ার কিছুই নেই। অর্থনীতিকে ঢাকিশুদ্ধ কর্পোরেট পুঁজির হাতে তুলে দেওয়ার লক্ষ্য পূরণে কোভিড অপ্রত্যাশিত সুযোগ এনে দিয়েছে, রাষ্ট্রযন্ত্রীরা কব্জি ডুবিয়ে তার সদ্ব্যবহার করছেন। এখন বড় প্রতিবাদ গড়ে তোলা কঠিন, গড়ে তুলতে চাইলেও দূরত্ববিধির সুযোগে রাষ্ট্র তাকে সহজেই দমন করতে পারবে, অতএব — আর দেরি নয়।

ধর্মমতের মহিমা হল, তাকে যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করার দরকার হয় না, বিশ্বাসে মিলায় বস্তু। বিশ্বাস যদি পাকা হয়, চোখের সামনে বিপরীত সাক্ষ্যপ্রমাণ খাড়া থাকলেও ভক্তরা বৃন্দগান জারি রাখেন। এমন বিশ্বাস আকাশ থেকে পড়ে না, তার জন্য অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয়। বাজারের স্বাধীনতাই প্রকৃত স্বাধীনতা—নিয়োলিবারাল অর্থনীতি নামক ধর্মমতের এই বীজমন্ত্রটির প্রতি জনগণমনে বিশ্বাস সৃষ্টি এবং লালনের জন্যও বিপুল আয়োজন করেছেন সেই অর্থনীতির চালক ও নায়করা। তার মহিমা এমনই যে, বাজারতন্ত্রের দুনিয়া-জোড়া দুঃশাসন এবং বিপর্যয় দেখতে দেখতেও তথাকথিত শিক্ষিত, এমনকি শিক্ষাবিদ অভিধায় পরিচিত ব্যক্তিরাও বিস্মিত প্রশ্ন তোলেন, "প্রতিবাদীরা একটা কথা বুঝিয়ে দেবেন? কৃষকরা যদি বাজারে ফসল বিক্রির স্বাধীনতা পান, তাতে ক্ষতি কী হবে?"

প্রশ্নকর্তারা একটি সহজ কথা ভেবে দেখতে পারেন। যে বাজারে কৃষকের ফসল বিক্রির স্বাধীনতা নিয়ে তাঁদের এত সন্তুষ্টি, সেই

বাজার কার নিয়ন্ত্রণে চলছে? দুনিয়া জুড়ে কৃষিপণ্যের বাজারে বড় পুঁজির আধিপত্য কীভাবে বেড়েছে,তা কোনও গোপন খবর নয়? যে কৃষক মহাজন বা কমিশন এজেন্ট-এর হাতে মার খাচ্ছেন, তিনি কর্পোরেট অধিপতিদের হাতে মার খাবেন না? তিনি মার না খেলে ওঁদের মুনাফা বাড়বে কী করে? যে অগণন ভারতীয় কৃষক আত্মঘাতি হয়ে চলেছেন, তাঁদের এক বিরাট অংশ এই কর্পোরেট পুঁজি শাসিত বাজারতন্ত্রেরই শিকার। শুধু কৃষি? স্কুল কলেজ হাসপাতাল বড় পুঁজির হাতে তুলে দেওয়ার পরিণাম কী, আমরা জানি না? 'খোলা বাজার' - এ স্বাস্থ্য পরিষেবা বেছে নেওয়ার মহান স্বাধীনতা কীভাবে বহু মানুষের পক্ষে প্রাণঘাতী হতে পারে আরও বহু মানুষকে সর্বস্বান্ত করতে পারে — সেই নির্মম সত্যের অনন্ত প্রদর্শনী আমরা দেখছি না?

নিমাই রায় এই সত্য দেখেছেন, বুঝেছেন। তিনি একা নন। দেশ জুড়ে বহু মানুষের অভিজ্ঞতা তাঁদের জানিয়ে দিচ্ছে যে, অর্থনীতির অন্য নানা পরিসরের মতোই কৃষিপণ্য এবং কৃষকের জীবন-জীবিকাকে বড় পুঁজির মৃগয়াভূমি হিসেবে চিহ্নিত করার নতুন পর্ব শুরু হবে এবার। কৃষিপণ্যের বাজার দখলের সূত্র ধরে জমি দখলের অভিযান জোরদার হবে। জমি অধিগ্রহণ আইন কৃষককে যেটুকু রক্ষাকবচ দিয়েছে, সেটুকুও কেড়ে নেওয়ার উদ্যোগ ইতিমধ্যেই দেখা গেছে, সম্মিলিত প্রতিরোধে একবার সে উদ্যোগ ব্যর্থ হয়েছে বলে ফের আক্রমণ হবে না — পুঁজিতন্ত্রে এমন বিধান কস্মিনকালেও নেই। কৃষিজমি উৎপাদনের উপকরণ। পুঁজিতন্ত্রের অমোঘ লীলায় ক্রমশ বহু কৃষকের হাত থেকে সেই উপকরণ চলে যাবে, নিজস্ব সম্পদ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে কৃষক শ্রমের বাজারে এসে দাঁড়াবেন তাঁর শ্রমশক্তি বিক্রয়ের জন্য, যে শ্রমশক্তি ছাড়া তাঁর আর কোনও সম্বল নেই।

সেই বাজারটিকেও স্বাধীনতা দিতে তৎপরতার অন্ত নেই। শ্রম আইন সংশোধনের জন্য যে সংসদের বাদল অধিবেশনের শেষ দিনটিই বাছা হল, তার প্রতীকী তাৎপর্য খেয়াল না করলে চলে না।

এই সংশোধনের মূল লক্ষ্য একটাই ঃ শ্রমিক নিয়োগ এবং ছাঁটাইয়ে নিয়োগকর্তাদের নিরঙ্কুশ অধিকার কায়েম করা। রাজ্য সরকার বা শ্রমিক সংগঠন, কারও এ ব্যাপারে কোনও ভূমিকা থাকবে না আর। ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে মুখোমুখি দাঁড়াবেন শ্রমশক্তির সব-হারানো বিক্রেতা এবং সর্বগ্রাসী ক্রেতা। ভুক্তরা বাষ্পাকুল চোখে অবলোকন করবেন, প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বাজারের নিরাবরণ স্বাধীনতা। পূর্ণ স্বরাজ।

কিষান স্বরাজ সমিতির রাজ্য টিম কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত
প্রকাশকাল : নভেম্বর ২০২০